কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা স্থগিত করা উচিত

ভিন্নমত

আবু আহমেদ

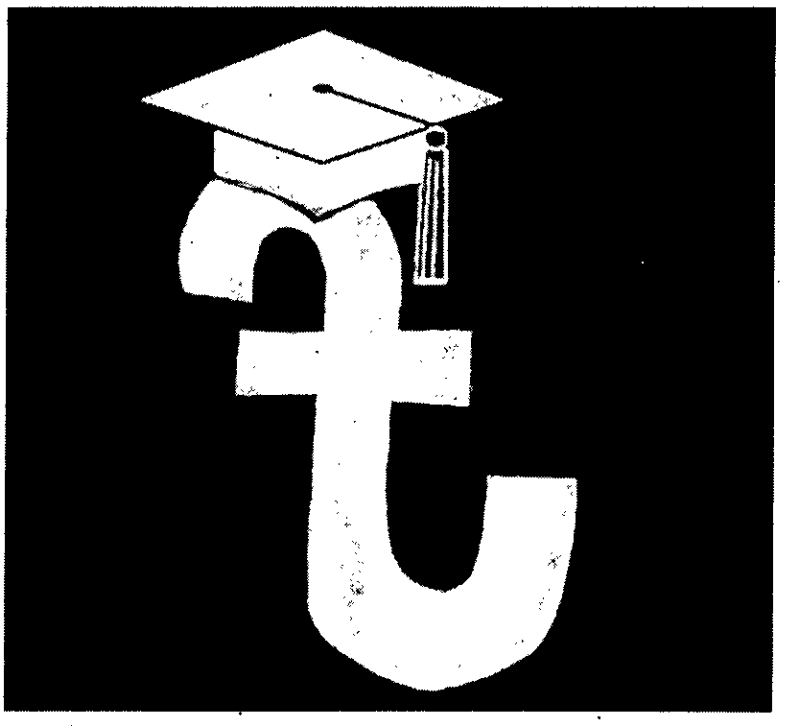

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি দেওয়া হচ্ছে জেলা শহরের জন্য। কিন্তু তাদের টান ঢাকার দিকে। তদবির করে শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি কাজ সমাধা করা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দুর্নীতি প্রবেশ করবে। আইনে আছে এসব বিশ্ববিদ্যালয় নন-প্রফিট সংস্থা। অর্থাৎ প্রফিট করে উদ্যোক্তারা তা ভাগ করে নিতে পারবে না। কিন্তু আমাদের শোনা মতে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রফিটের একটা অংশ কৌশলে ভিন্নভাবে উদ্যোক্তা ট্রাস্টিদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছে

দারুল ইহসান তো ছিল একাডেমিক ডিগ্রি বেচে বাণিজ্য করার একটা নিকৃষ্টতম উদাহরণ। দারুল ইহসানের মতো আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো একই কাজ করছে। ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবাই দেখছে, কিন্তু কথা আর দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া শক্ত কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি-অনুমোদন পাওয়া অতি সহজ হয়ে গেছে। আমাদের স্কুলজীবনে দেখেছি, একটা বিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া, সেটা হাইস্কুলের জন্য হোক বা প্রাইমারি স্কুলের জন্য, অত সহজ ছিল না। স্কুলের অনুমতি-অনুমোদন পেতে অনেক শর্ত পূরণ করতে হতো। আর অনুমোদন দিলেও সেটা অস্থায়ী ভিত্তিতে দেওয়া হতো। পরীক্ষার ফল ভালো না হলে সে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হতো। হাইস্কুলের অনুমোদন দেওয়ার আগে প্রার্থিত স্কুলের ছাত্রদের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হতো। ওই স্কুলের ছাত্ররা পাবলিক পরীক্ষায় ভালো করলে তবেই স্কুলটিকে অস্থায়ী অনুমোদন দেওয়া হতো। সেই অস্থায়ী অনুমোদন শর্ত পূরণসাপেক্ষে দুই বছর পরপর নবায়ন করা হতো। এতে স্কুলের ওপর একটা চাপ থাকত। স্কুলের অনুমোদন নবায়ন করতে হলে ছাত্রদের অবশ্যই ভালো ফল করতে হবে। আমার জানা মতে, কলেজের অনুমোদনের ক্ষেত্রে শর্ত আরো শক্ত ছিল। তখন স্কুল-কলেজ সংখ্যায় অনেক কম ছিল, কিন্তু পড়ালেখাটা ছিল। তখন কোনো স্কুল রাজনৈতিক উপজেলা চেয়ারম্যানকে প্রধান অতিথি করে এনে ছাত্রদের দ্বারা মানবসেতু নির্মাণ করে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দিত না বা ওই রকম চিন্তাও কল্পনার বাইরে ছিল। অবশ্য আমি যখনকার কথা বলছি, তখন উপজেলা ছিল না। তখন ছিল থানা আর মহকুমা। আজকে সব মহকুমাই জেলায় পরিণত হয়েছে। এখন আর কয়েকটি মহকুমা মিলে একটা জেলা হয়—এমন কিছু নেই। তখনো স্কুল-কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কেউ প্রধান বা বিশেষ অতিথি হিসেবে আসতেন। তবে তিনি হতেন কোনো বিজ্ঞানী-দার্শনিক, যাঁর কথায় জ্ঞানের উৎস খুঁজে পাওয়া যেত। কোনো কোনো অনুষ্ঠানে এসডিও-ডিসিরাও আসতেন। তবে ওই এসডিও-ডিসিরা ছিলেন পরীক্ষায় পাস করা কৃতী প্রশাসক। যা হোক, বলছিলাম শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার মানে অধঃপতনের কথা। বেশি বিস্তার হলে মানের অধঃপতন হয়, এটা যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে তো বিস্তারের লাগাম টেনে ধরা উচিত।

দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, বিদ্যাপ্রার্থী ছাত্রের সংখ্যাও বাড়ছে। সরকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সবার জন্য শিক্ষা সরবরাহ করতে পারবে না—এই বোধ থেকে শিক্ষাকে ব্যক্তি খাতে যাতে দেওয়া যায় সে ব্যাপারে অনুমোদন দিল। সেই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। কারণ হলো, এরই মধ্যে বাংলাদেশে অর্থনীতির অন্যান্য খাত ব্যক্তি খাতে চলে গেছে বা ব্যক্তি খাত সরকারি খাতকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু শিক্ষাকে সরকারি খাতে আবদ্ধ রাখা সম্ভবও হচ্ছিল না, কাঙ্ক্ষিতও ছিল না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটা প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে উঠতে পারে—এটা আমাদের অর্থনীতির জ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে যেটা দরকার ছিল ও আছে সেটা হলো, শক্ত রেগুলেশনের। কোনো ব্যক্তি খাতই কাঙ্ক্ষিত ফল দেয় না রেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রণ-তদারকি ছাড়া। শিক্ষা তো নয়ই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে রেগুলেশন-নিয়ন্ত্রণ এখন অতি দুর্বল। এই পথেও এখন দুর্নীতি প্রবেশ করেছে অতি
ভাবে। নৈতিক মানদণ্ডের স্খলন হয়ে গেছে বহু
গেই। যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুও যায় যায়। ফল
ছ, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সার্টিফিকেটধারী অনেক
ক্ষিত লোক উৎপাদন করছে, কিন্তু ওগুলোর
কারিতা নেই বলে বাজারে চাহিদাও নেই। এখন
নকে বিশ্বাসই করে না যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়
ক পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা কেউ কিছু জানে, জানে
তো অনেক কিছু। কিন্তু সেই অনেক কিছুরও পরীক্ষা
। যায় যখন এই পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা কোনো
র্জাতিক পরীক্ষায় বা অন্য দেশের সমপর্যায়ের
াদের সঙ্গে একই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।
বিদ্যালয় তো বিশ্ববিদ্যালয়ই, এই বিদ্যালয়কে
ালিক-প্রাইভেট নাম দিল কে? হ্যাঁ বিদেশেও আছে,
ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সম্পূর্ণ সরকারি ফান্ডিংয়ে চলে
ওগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বলে, আর প্রাইভেট ডোনেশনে, ছাত্রদের টিউশন ফিতে ও এনডাওমেন্টের (Endowment) অর্থে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় চলে সেগুলো হলো প্রাইভেট। তবে ওসব দেশে কথায় কথায় কেউ পাবলিক-প্রাইভেট বলে না। কোনটা পাবলিক, কোনটা প্রাইভেট জানতে হলে ওগুলোর ফান্ডিং বোঝানো ও প্রশাসনের ধরন দেখে জানতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও অতি নামি, আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ও অতি প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধতার দিক দিয়ে একে অন্যের থেকে যেন এগিয়ে আছে।

আমাদের দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলো, আমার জানা মতে, ১৯৯১-১৯৯২ সাল থেকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সেটাও শুরু হয়েছিল কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে ভাড়া বাড়িতে। তখন আমাদের সবার একটা মৌন সমর্থন ছিল ধারণাগতভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগের জন্য আমার মতো অনেকেই খুশি হয়েছিল। আমাদের ভাবনা ছিল, এতে ছাত্রদের যেমন উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে সুবিধা হবে, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষায় ব্যক্তি উদ্যোগ অনুমোদন পেলে এতে শিক্ষার একটা প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি হবে। আমার মনে আছে, এর পক্ষে তখন আমি ইংরেজি ও বাংলায় কয়েকবার লিখেছিও। আজ কিন্তু অনেক দুঃখ পাই। যে স্বপ্ন আর ধারণা নিয়ে সেদিন উচ্চশিক্ষায় ব্যক্তি খাতের সম্পৃক্ততার পক্ষে লিখেছিলাম, সেই স্বপ্ন অনেকটা দিবাস্বপ্নে রূপ নিয়েছে। কিন্তু ধারণাটা ঠিকই আছে। ধারণার দোষ নেই। দোষ হলো, আমরা সর্বত্র যেমন অতি বেশি কিছু করে ফেলি অথবা সবার জন্য দুয়ার খুলে দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অতি চাপে সবই সাঙ্গ করে ফেলি, সেটাই আজকে ঘটছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুপাত-অনুমোদন ও রেগুলেশনের ক্ষেত্রে। অনুমতি-অনুমোদন প্রক্রিয়া যদি এতই সহজ হয়, তাহলে যে কোউ চাইবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে। কেন এত লোক এত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চাচ্ছে? উত্তর সহজ, বাণিজ্য করা যায় একাডেমিক ডিগ্রি বেচে। যদি তাদের হাতে একাডেমিক ডিগ্রি দেওয়ার ক্ষমতা না থাকত তাহলে কোন ভদ্রলোক কয়টা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছে সেটা বোঝা যেত। আগে শুনতাম শিক্ষা অনুরাগীরা বিদ্যালয় স্থাপন করছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ শিক্ষক হচ্ছেন, কেউ জমি দিচ্ছেন, কেউ ইট-টিন দিচ্ছেন। ওইসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে সেইসব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অন্য সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে বিদ্যালয়ের জন্য সুনাম কুড়াত। ব্যক্তি উদ্যোগে উচ্চশিক্ষার প্রসার ভালো। কিন্তু দুঃখজনক হলো, কিছু ব্যক্তি প্রসারের নামে সার্টিফিকেট বেচার দোকান খুলে বসেছে। বাজারের কোনো বিল্ডিংয়ের দুটি-তিনটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে শুরু করে দিয়েছে এমবিএ-এমএ-ব্যাচেলরস ডিগ্রি বেচা-কেনার দোকান। তাদের উৎপাদিত গ্র্যাজুয়েটদের মান যাচাইয়ে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। ইউজিসি আছে বটে, তবে মনে হয়, এই সংস্থা কোন কোর্স পড়ানো যাবে বা হবে, সেই অনুমোদনটা দিয়েই কাজ শেষ করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সার্টিফিকেট বাণিজ্যের ফ্যাক্টরিগুলোতে মানসম্মত শিক্ষক আছে কি না বা শিক্ষাদান হচ্ছে কি না—এসব ক্ষেত্রে তদারকি করার জন্য ইউজিসি যেন অপারগ। আমি জানি না, ইউজিসির ক্ষমতার ঘাটতি আছে কি না। ক্ষমতা থাকলে তা প্রয়োগ করা উচিত। আর ক্ষমতার কমতি থাকলে আইন পরিবর্তন করে উচ্চশিক্ষা রেগুলেশনের ক্ষেত্রে ইউজিসিকে সব ক্ষমতাই দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রেগুলেশনের ক্ষেত্রে দ্বৈত কর্তৃত্বেরও অবসান হওয়া উচিত। নতুন অনুমোদনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের একটা মতামত থাকতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ইউজিসির মতামতকে সমভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আজকে যখন দেখি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিলবোর্ডের ওপর লিখেছে ইউজিসি ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, তখন তো বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ ক্ষেত্রে দ্বৈত রেগুলেটরি ব্যবস্থা কাজ করছে। ইউজিসির কাজ হলো যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আইন মানতে অনিচ্ছুক তারা দৌড়ে ওই জায়গায়ই যাবে যে জায়গায় গেলে তাদের কাজ হয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি মন্দ হয়নি। কিন্তু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এই আইনকে কাগজ-কলমে মানলেও বাস্তবে প্রতিষ্ঠাতারা বা উদ্যোক্তারা ছড়ি ঘুরাচ্ছে। ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় তাদের স্যার বলতেই ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা ছাড়া হতেই পারে না। যদি বাড়িতে একাডেমিক ডিগ্রি দিতে হয় তাহলে তো এ দেশের পুরনো ডিগ্রি কলেজগুলো এসব কথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ভালো মানের ডিগ্রি দিতে পারত। ইউজিসির উচিত হবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের একটা অংশ যাতে গবেষণার জন্য ব্যয়িত হয় সেটা দেখা। আর শুধু বাজেটে বরাদ্দ রাখলেই হবে না, সেই অর্থ যাতে প্রকৃতই সেই কাজে ব্যয় হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় যাতে মৌলিক বিজ্ঞান বিষয়গুলোও পড়ায়, সে ব্যাপারেও ইউজিসির একটা ভূমিকা থাকা উচিত। ইউজিসিকে ভাবতে হবে, এসব বিশ্ববিদ্যালয় কেন শুধু বিবিএ, এমবিএ নামের কোর্স দিয়ে শুরু হচ্ছে। অন্তত এখন তো এই দৌড় বন্ধ করা উচিত।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি দেওয়া হচ্ছে জেলা শহরের জন্য। কিন্তু তাদের টান ঢাকার দিকে। তদবির করে শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি কাজ সমাধা করা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দুর্নীতি প্রবেশ করবে। আইনে আছে এসব বিশ্ববিদ্যালয় নন-প্রফিট সংস্থা। অর্থাৎ প্রফিট করে উদ্যোক্তারা তা ভাগ করে নিতে পারবে না। কিন্তু আমাদের শোনা মতে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রফিটের একটা অংশ কৌশলে ভিন্নভাবে উদ্যোক্তা ট্রাস্টিদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় এখন অনেক হয়ে গেছে। আমরা যখন ব্যক্তি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলাম, তখন আমাদের মনে ছিল এ দেশে মানসম্মত পাঁচ-ছয়টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে ভালো হতো! অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৯০টি কিংবা তারও বেশি এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে তা কল্পনায়ও আসেনি। আজ যখন শুনি এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আরো ১০-১২ জন ক্যান্ডিডেট আছে, তখন ভাবি, শুধুই কি শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে? ইউজিসি ও মন্ত্রণালয় একটা কাজ করতে পারে, এ নতুন প্রার্থীদের বলে দিতে পারে এক শর্তে আপনারা অনুমোদন পাবেন, তা হলো, তিন বছর আপনাদের ছাত্রদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দিতে হবে। যদি প্রমাণ হয় যে আপনারা ভালো শিক্ষাদানে সফল, তাহলে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলার অনুমতি দেওয়া হবে। আর পরীক্ষামূলক তিন বছরে আপনাদের যেসব ছাত্র পাস করে বের হবে তারা আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেই ডিগ্রিটা পাবে। শুধু পরীক্ষাগুলো অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে হবে। তবে তারা বলতে পারে এটা কী করে সম্ভব, পরীক্ষা তো হয় সেমিস্টার পদ্ধতিতে? এটাও সম্ভব, শুধু ইউজিসি-মন্ত্রণালয় কঠোর হতে চাইলে। অন্য মতামত হলো, এরই মধ্যে কিছু অনুমোদন পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরও একাডেমিক ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের একটা মেসেজ দেওয়া যেতে পারে যে তোমরা হয় এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাবে, না হলে একাডেমিক ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা রহিত করা হলো বা হবে। আজ যদি ইউজিসি-মন্ত্রণালয় স্রেফ অনুমোদন-অনুমতি দিয়েই কাজ শেষ করেছে মনে করে, তাহলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট বেচার বাণিজ্য বন্ধ হবে বলে আমরা মনে করি না। যে শিক্ষকদের নাম বেচে তারা অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত দিয়েছে বা অনুমোদন পেয়েও গেছে, প্রকৃতপক্ষে ওসব শিক্ষক এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন কি না বা তাঁরা পাঠদান করেন কি না এটা তো অন্তত ইউজিসি দেখতে পারে। অনুমোদন-অনুমতি যারা দেয় তারা প্রত্যাহারও করতে পারে। অনুমোদন-অনুমতি চিরকালের জন্য হয় না, এটাও বুঝতে হবে অনুমোদন-অনুমতি প্রদান কর্তৃপক্ষকে।

লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা

অনিবার্য কারণে আবদুল গাফফার চৌধুরীর নিয়মিত কলাম 'কালান্তরের কড়চা' আজ প্রকাশ করা গেল না।

বি. স.